লোহিতসাগরের অতলে

রাজর্ষি পাল

ঝটিকা সফরে ইজিপ্ট। সময়টা ২০২৩-এর শুরু। তবে সুপরিচিত কায়রো অথবা আলেকজান্দ্রিয়া নয়। এবারে গন্তব্য সিনাই পেনিনসুলা এবং রেড সী। লোহিতসাগরের গভীরে স্কুবা ডাইভিং-এর রোমাঞ্চ। তার আগে বোঝার সুবিধার্থে দিই ভৌগোলিক বর্ণনা। সিনাই পেনিনসুলা বা সিনাই উপদ্বীপ লোহিতসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যে পার্বত্য মরু অঞ্চল। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে স্থলপথ সিনাই উপদ্বীপ। এটি মিশরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এবং মিশরের ভূখণ্ডের ছয় শতাংশ। সিনাইয়ের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমধ্যসাগর এবং লোহিতসাগরের সংযোগকারী সুয়েজ খালের নিরাপত্তা সিনাই-এর নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। এখানে আছে ষষ্ঠ শতাব্দীর সেন্ট ক্যাথরিন মঠ—বাইবেলে বর্ণিত মাউন্ট সিনাই পর্বতের কাছে অবস্থিত। মাউন্ট সিনাইয়ের উঁচু চূড়া সূর্যোদয়ের দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত। সিনাই পর্বত জাবাল মুসা নামেও পরিচিত। এটিই সম্ভবত ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ বর্ণিত সিনাই পর্বত যেখানে মোজেস ঈশ্বরের দশটি আদেশ (টেন কমান্ডমেন্টস) পেয়েছিলেন। হলিউডের ব্লকব্লাস্টার অস্কারজয়ী সিনেমা 'টেন কমান্ডমেন্টস'-এ এর বর্ণনা আছে।

সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিমে সিনাই এবং মিশরের মূল ভূখণ্ডের মাঝে লোহিতসাগর পরিচিত গাল্ফ অফ সুয়েজ নামে, আর সিনাই-এর পুবদিকের সমুদ্র পরিচিত গাল্ফ অফ আকাবা নামে। এর অন্য পাড়ে সৌদি আরবের অবস্থান।

মিশরের মূল ভূখণ্ড আর সিনাই উপদ্বীপের মাঝে কৃত্রিম সমুদ্র জলপথ সুয়েজ ক্যানাল। এর মাধ্যমে ভূমধ্যসাগর থেকে লোহিতসাগরে যাওয়া যায়। প্রায় দুশো কিলোমিটার দীর্ঘ সুয়েজ ক্যানাল ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ। ১৮৫৯ থেকে দশ বছর খালটির নির্মাণকাজ চলে। ১৭ নভেম্বর ১৮৬৯ এটি খুলে দেওয়া হয়। এটি দিয়ে জাহাজ ভূমধ্যসাগর এবং লোহিতসাগর হয়ে উত্তর আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগরের মধ্যে সরাসরি চলাচল করে, এতে দক্ষিণ আটলান্টিক এবং দক্ষিণ ভারত মহাসাগরকে এড়িয়ে চলা যায়। আরব সাগর থেকে লন্ডন পর্যন্ত যাত্রার দূরত্ব প্রায় ৮৯০০ কিলোমিটার

ইংল্যান্ড প্রবাসী চিকিৎসক

(৫৫০০ মাইল) কমে গেছে সুয়েজের মাধ্যমে।

সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তে শার্ম আল শেখ, লোহিতসাগরের পাড়ে রিসর্ট শহর। বালুকাময় জনবিরল সৈকত, পেছনে রুক্ষ পাহাড়ের সারি, স্বচ্ছ জল ও সমুদ্রের গভীরে প্রবালপ্রাচীর—সব মিলে এক মোহনীয় সুন্দর জায়গা শার্ম আল শেখ।

বিমান থেকে

২০১৫ সালে সিনাইতে রুশ পর্যটকবাহী এক বিমান বিধ্বস্ত হয়ে দুশো চব্বিশ জন আরোহী নিহত হওয়ার পর দেশটির পর্যটনশিল্প বড় সংকটে পড়ে। কোভিড লকডাউনের পর বর্তমানে পর্যটনশিল্প ফের ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে আছে মেরিন রিজার্ভ। নাম রাস মোহাম্মদ ন্যাশনাল পার্ক। ডাইভিং এবং স্নরকেলিং করার আদর্শ স্থান। এই মেরিন রিজার্ভে মাছ ধরা বা বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল বেআইনি। এখানকার সমুদ্রে দেখা পাওয়া যায় প্রায় হাজার প্রজাতির মাছ এবং অন্যান্য প্রাণী। এই পার্কে সমুদ্রের গভীরে আছে প্রবালপ্রাচীর। আর আছে থিসলগর্ম রেক, যা আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এক যুদ্ধজাহাজের ধ্বংসাবশেষ, বর্তমানে সমুদ্রের গভীরে শায়িত।

জানুয়ারির চার তারিখ। বৃষ্টি এবং ঝড়ের মধ্য দিয়ে তিন ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে যখন ব্রিস্টল এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। কনকনে শীতল রাত। গাড়ি পার্ক করে এয়ারপোর্ট টার্মিনালে ঢুকলাম। ভোরবেলায় ফ্লাইটে ওঠার আগে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা। কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন চেকিং-এর পর অবশেষে বিমানে বসা। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার বিমানযাত্রায় শার্ম আল শেখ। দীর্ঘ যাত্রাপথে পেরোলাম ব্রিটেন ছাড়িয়ে ইংলিশ চ্যানেল, দক্ষিণ ইউরোপের মূল ভূখণ্ড, তুষারাবৃত আল্পস পর্বতমালা, ভূমধ্যসাগর, উত্তর আফ্রিকার মরুভূমি এবং শেষে রেড সী ছাড়িয়ে সিনাই পেনিনসুলা, অবশেষে শার্ম আল শেখ।

মরুভূমির মধ্যে ছিমছাম গোছানো শহর। ইউরোপীয় শহরই বলা যায়। আসলে শহরের অর্থনীতি পুরোপুরিই নির্ভরশীল ইউরোপীয় পর্যটকদের ওপর। বিমানবন্দর থেকে গাড়িতে আধঘণ্টা গিয়ে হারবার। অপেক্ষারত আমাদের ক্রুজ জাহাজ। আগামীকাল মোট তিনবার ডাইভিং হবে। ডাইভিং লগবুক, ডাইভিং-এর কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট চেক করা হল। তার সঙ্গে ডাইভিং ইনস্যুরেনস। ডাইভিং-এর যন্ত্রপাতিও চেক করা হল। বিসিডি, রেগুলেটর, বাতাসের সিলিন্ডার আর আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। এগুলোতে খুঁত থাকা চলবে না, নাহলে সমুদ্রের গভীরে বিপদ ঘটবে। সিলিন্ডারে বাতাসের বদলে নাইট্রক্স—নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের মিশ্রণ। সাধারণ বাতাসে অক্সিজেন থাকে একুশ শতাংশ আর নাইট্রোজেন আটাত্তর শতাংশ। সাধারণ বাতাস ব্যবহার করলে সমুদ্রে নির্দিষ্ট গভীরতা অবধি নামা যায় (চল্লিশ মিটার বা একশো কুড়ি ফুট, অর্থাৎ বারো তলা সমান গভীরতায়)। এর গভীরে নামলে জটিল শারীরবৃত্তীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে, যাকে বলে

নাইট্রোজেন নারকোসিস। মস্তিষ্ক ও নার্ভে নাইট্রোজেন দ্রবীভূত হয়ে বিভ্রম ঘটে। এতে সমুদ্রের গভীরে দুর্ঘটনা অনিবার্য। এ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সিলিন্ডারে নাইট্রোজেনের শতাংশ কমিয়ে অক্সিজেনের শতাংশ বাড়ানো হয়। কতটা গভীরে নামা হবে তার ওপর ভিত্তি করে এই শতাংশ নির্ণয় করা হয়। এটা এক জটিল ক্যালকুলেশন। সিলিন্ডারের নাইট্রক্সে কতটা অক্সিজেন আছে সেটা পরীক্ষা করার যন্ত্র আছে। আমাদের জাহাজে ক্রু-রা ছাড়া এগারোজন ডাইভার। জার্মানি আর গ্রিস থেকে চারজন করে আর পর্তুগাল থেকে দুজন।

৫ জানুয়ারি। আজ প্রথমবার ডাইভিং হল শার্ম আল শেখের অদূরে। সমুদ্রের গভীরে প্রবালপ্রাচীর। বেশি গভীরে নামিনি। এটা প্র্যাকটিস ডাইভিং। যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক কাজ করছে কী না সেটাই পরীক্ষা করা। ক্যামেরা নেওয়া বারণ। তাতে মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটবে। জলের তলায় মিনিট চল্লিশ কাটিয়ে উঠে আসা। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে ফের জলে নামা। এবারে নামলাম আরও গভীরে। এবার ওয়াটারপ্রুফ ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে নেমেছিলাম। সমুদ্রের গভীরে লুক্কায়িত রঙ-বেরঙের প্রবাল-প্রাচীরের স্তর। এক অন্য জগৎ। গোপন স্বর্গোদ্যান। জল থেকে উঠে এসে বিশ্রাম। ইতোমধ্যে জাহাজ চলতে শুরু করেছে। সিনাই পেনিনসুলা-র পূর্ব উপকূল ধরে—তটরেখার সমান্তরালে কয়েক মাইল দূর দিয়ে দক্ষিণদিকে দীর্ঘ যাত্রা। ঘণ্টা দুয়েক যাত্রার পর সিনাই পেনিনসুলা-র দক্ষিণতম বিন্দুতে পৌঁছে জাহাজ উত্তর দিকে মোড় নিল। এবার আমরা সিনাই-এর পশ্চিম উপকূলে। এবারে উত্তরমুখী যাত্রা। ঘণ্টাখানেক পর যেখানে থামলাম সেখানে দূরে দূরে বেশ কিছু দ্বীপ। জায়গাটা পরিচিত শাহ মাহমুদ নামে। এখানে জলের তলায় আছে যুদ্ধজাহাজের ধ্বংসাবশেষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের। এস এস থিসলগর্ম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মিত্রবাহিনী তথা ব্রিটিশ-আমেরিকান নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ। ১৯৪১ সালের ২ জুন ব্রিটেনের গ্লাসগো বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে। যুদ্ধের প্রয়োজনে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান এবং ভারি ক্যালিবার মেশিনগান লাগানো হয়েছিল। ইউরোপের সীমানা ছাড়িয়ে উত্তর আফ্রিকায় তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর ডামাডোল। জার্মান-ইটালিয়ান অক্ষশক্তির সঙ্গে মিত্রবাহিনী তথা ব্রিটিশ-আমেরিকানদের যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে। জার্মান জেনারেল রোমেল-এর বাহিনীর সঙ্গে ব্রিটিশ জেনারেল মন্টগোমারির বাহিনীর মরণপণ লড়াই চলছে। জাহাজ ভর্তি সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে থিসলগর্ম যাত্রা শুরু করে। গন্তব্য মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর। সেখান থেকে যুদ্ধের সরঞ্জাম পৌঁছবে উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির রণাঙ্গনে। ভূমধ্যসাগরের সহজ জলপথ তখন অতীব বিপজ্জনক। আকাশে জার্মান-ইটালিয়ান বিমানবাহিনীর হানাদারি। অনেকটা ঘুরপথে যাত্রা শুরু হল। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল দিয়ে গিয়ে কেপ অফ গুড হোপ ঘুরে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বেয়ে প্রবেশ করল লোহিতসাগরে। উদ্দেশ্য সুয়েজ ক্যানাল বেয়ে পৌঁছবে আলেকজান্দ্রিয়া। শেষরক্ষা হল

প্রবালপ্রাচীর

স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিসিডি থেকে বাতাস বের করে দিয়ে ডুবে যাওয়া। ত্রিশ মিটার গভীরে নেমে এলাম যেখানে রয়েছে থিসলগর্ম। অভূতপূর্ব অনুভূতি। টাইম মেশিন বেয়ে পৌঁছে গেলাম বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে। আমরা এখন বারোতলা আন্দাজ গভীরে। চারপাশে আবছায়া। সূর্যের আলো এতটা গভীরে

ডুবে যাওয়া সামরিক সরঞ্জাম

না। সুয়েজ ক্যানালে এক দুর্ঘটনায় জলপথ সাময়িকভাবে বন্ধ।

গুবাল প্রণালীর উত্তরে একটি নিরাপদ স্থানে নোঙর করল থিসলগর্ম, যা আজ শ্যাগ রক নামে পরিচিত। ভূমধ্যসাগরের ক্রীট দ্বীপে জার্মান বিমানবাহিনীর ঘাঁটি। জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের কাছে খবর ছিল লোহিতসাগর বেয়ে মিত্রবাহিনীর জাহাজ সামরিক সরঞ্জাম পৌঁছে দিচ্ছে উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনে। লোহিতসাগরের ওপরে আকাশপথে টহল দিচ্ছিল দুটি জার্মান বোমারু বিমান। ১৯৪১ সালের ৬ অক্টোবর ভোররাতে তাদের দুটি বোমার আঘাতে থিসলগর্ম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে যায়। বিস্ফোরণে ন-জন নাবিক এবং সৈন্য মারা যান। বর্তমানে সমুদ্রের তলদেশে ত্রিশ মিটার গভীরে শায়িত থিসলগর্ম। বোমায় বিধ্বস্ত অংশ ছাড়া অনেকাংশে অক্ষত। আজও জাহাজের অন্দরে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, মিলিটারি ট্রাক, ট্র্যাঙ্ক ইত্যাদি। ডাইভিং করে দুবার নেমেছিলাম থিসলগর্মের অন্দরে। পাঁচ তারিখ বিকেলে আর ছ-তারিখ ভোরবেলা। ধরাচুড়ো পরে সমুদ্রে ঝাঁপ। প্রবল ঢোকে না। জ্বালাতে হল ডাইভিং টর্চ। একজনের পেছনে আর একজন ধীরগতিতে ভরশূন্য অবস্থায় প্রবেশ করলাম মৃত যুদ্ধজাহাজের অন্দরমহলে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে টর্চের আলোয় এক চেম্বার থেকে আর এক চেম্বার। ফিনসের মৃদু সঞ্চালনে এগিয়ে চলা। থরে থরে সাজানো অস্ত্রশস্ত্র, কামান, ট্যাঙ্ক, সামরিক গাড়ি। প্রেতসুলভ অন্ধকারে সাড়া পেয়ে উত্তেজিত জলজ প্রাণ, গভীর অন্ধকার প্রকোষ্ঠেই যাদের নিঃশব্দ বিচরণ। টর্চের আলো দেখে উত্তেজিত হয়ে মুখের সামনে চলে আসছে মাছের পাল। ক্যামেরাবন্দি করেছিলাম এই অভিজ্ঞতা। সমুদ্রের গভীরে জাহাজের ধ্বংসাবশেষে প্রবেশ

আসলে স্কুবা ডাইভিং-এর আলাদা স্পেশালিটি। এর জন্য প্রয়োজন আলাদা ট্রেনিং। কয়েক বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় থাকার সময় সুযোগ পেয়েছিলাম এই ট্রেনিং নেওয়ার। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে ভারত মহাসাগরের গভীরে শায়িত অস্ট্রেলিয়ান নেভির ডেস্ট্রয়ার এইচ এম এ এস সোয়ান-এর ধ্বংসাবশেষে হয়েছিল ট্রেনিং।

স্টিং রে

লোহিতসাগরের স্টিং রে

লোহিতসাগর স্টিং রে-র আবাসস্থল। বাংলায় স্টিং রে শঙ্কর মাছ নামে সুপরিচিত। লম্বা বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত লেজ তার। নীল দাগযুক্ত স্টিং রে লোহিতসাগরে বেশি দেখা যায়। এরা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। এছাড়াও ঈগল রে নামে আর এক ধরনের স্টিং রে-ও দেখা যায় যা আকারে বিশাল এবং গাঢ় বাদামি বা কালো রঙের হয়। স্টিং রে সাধারণত আক্রমণাত্মক হয় না। তারা স্বভাবত কৌতূহলী। ডুবুরি বা অচেনা জীব দেখলে তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পালিয়ে যাওয়া। ভিতু এবং নিরীহ হলেও, নীল দাগযুক্ত রিবন-টেল স্টিং রে তার বিষাক্ত লেজের কাঁটা দিয়ে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করতে সক্ষম। বেশিরভাগ স্টিং রে-র লেজে বিষাক্ত কাঁটা থাকে যা তারা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করে। বিষাক্ত লেজের আঘাতে রক্তপাত হয়, ক্ষতস্থান ফুলে যায় এবং খুবই যন্ত্রণা হয়। বিষের কারণে বমি, ডায়রিয়া, খিঁচুনি এমনকী পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে। ক্ষতস্থানে গরম জল ঢাললে তা অবশিষ্ট বিষকে নিষ্ক্রিয় এবং ব্যথা উপশম করতে পারে। স্টিভ আরউইন ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, বন্যপ্রাণী বিশারদ ও পরিবেশবিদ। 'দ্য ক্রোকোডাইল হান্টার' নামে পরিচিতি লাভ করেন তিনি। ডিসকভারি চ্যানেলে বন্য জীবজন্তুদের সঙ্গে প্রোগ্রাম পরিবেশন করে পৃথিবী বিখ্যাত হন। ২০০৬ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে তথ্যচিত্র তৈরির সময় স্টিং রে-র আক্রমণে মারা যান তিনি। এই মৃত্যু নিয়ে কিছু রহস্যের সমাধান আজও হয়নি।

লোহিতসাগরে স্কুবা ডাইভিং-এর সময় রিবন টেল স্টিং রে এবং ঈগল রে-র একদম মুখোমুখি হয়েছিলাম। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তাদের ছবি এবং ভিডিও তুলেছিলাম। লোহিতসাগরের স্টিং-রে আমার অভিজ্ঞতায় তুলনামূলকভাবে নিরীহ। কয়েকমাস আগে বাহামায় স্কুবা ডাইভিং-এর সময় আটলান্টিকের গভীরে স্টিং রে-র আক্রমণের মুখে পড়ি। দ্রুতগতিতে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলাম। ঘটনাটির ভিডিও তোলার সুযোগ হাতছাড়া করিনি।

শাহ মাহমুদ

সিনাই পেনিনসুলা-র পশ্চিমে লোহিতসাগরের তলায় জেগে আছে প্রবালপ্রাচীরের উপরের অংশ, দ্বীপপুঞ্জের আকারে। প্রবাল দ্বীপগুলির মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত খরস্রোতা সাগর। সমুদ্রের গভীরে কোরাল গার্ডেন। রং-বেরঙের প্রবালের স্তূপ, বিভিন্ন আকারের এবং জ্যামিতিক নকশার। সাগরের

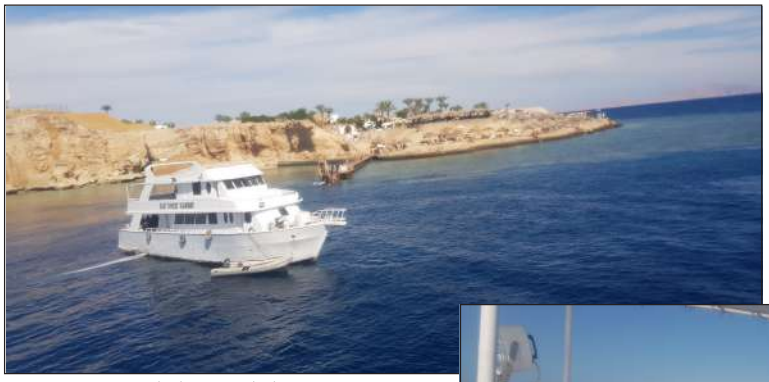

আমাদের জাহাজ

ফটোগ্রাফি। দুপাশে দুই প্রবালপ্রাচীরের মাঝখানে সাগরের গভীরে সুড়ঙ্গপথ। সেই পথ বেয়ে প্রবাল উদ্যানের কয়েক ফুট ওপরে ভেসে থেকে এগিয়ে চললাম আমরা। সবাই

স্পিড বোটে লেখক

গভীরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বর্গীয় উদ্যান। প্রবালপ্রাচীরের আড়ালে প্রাণের স্পন্দন। রঙিন মাছ, কচ্ছপ, অক্টোপাস, হাঙর।

দ্বীপপুঞ্জের বাইরে খোলা সমুদ্রে নোঙর করল আমাদের জাহাজ। ডাইভিং-এর পোশাক পরে যন্ত্রপাতি নিয়ে স্পিড বোটে উঠলাম। সমুদ্রে তুফান তুলে ছুটে চলল স্পিড বোট। দুপাশের দ্বীপপুঞ্জের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। যেখানে থামলাম সেখানে কয়েকশো মিটার দূরে পুবদিকে সিনাই পেনিনসুলা-র বালিয়াড়ির চর আর এদিক ওদিক জেগে থাকা প্রবালপ্রাচীরের মাথা, দ্বীপের আকারে।

মুখে মাস্ক পরে, বাতাসের সিলিন্ডার পিঠে নিয়ে যন্ত্রপাতি সামলে এক-এক করে পেছন ঘুরে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। কিছুটা তলিয়ে গিয়ে ভেসে উঠলাম। এবার সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে সংকেত বিনিময় করে বিসিডি থেকে বাতাস বের করে সাগরের গভীরে ডুব। ডুবতে ডুবতে পৌঁছে গেলাম অনেক গভীরে যেখানে আছে কোরাল গার্ডেন। চারপাশে রং-বেরঙের প্রবালের স্তূপ আর রঙিন মাছের পাল। যেন মহাকায় প্রাকৃতিক অ্যাকোরিয়াম। এবার একই গভীরতায় ভসে থেকে ফিনসের মৃদু সঞ্চালনে এগিয়ে চলা। সঙ্গে ক্যামেরায় বন্দি কাছাকাছি আছি, কারণ আড়ালে থাকতে পারে হিংস্র জলজ প্রাণী।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ পর প্রবালের দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে আমরা এখন খোলা সমুদ্রে। মাথার ওপরে ভাসিয়ে দিলাম গাঢ় কমলা রঙের সারফেস মার্কার বয়া। পলিথিনের তৈরি হালকা বেলুনের মতন। প্রশ্বাসের বাতাস দিয়ে ফুলিয়ে দিলে সাগরের গভীর থেকে উঠে জলের ওপরে উল্লম্ব হয়ে ভেসে থাকে। সিগন্যাল দেখে এগিয়ে আসে জাহাজ। আমরাও সাগরের গভীর থেকে একে একে উঠে আসি জাহাজের ডেক-এ। সময় লাগল ঘণ্টাখানেক। দিনের বাকি সময়টা এখানেই নোঙর করে থাকল জাহাজ। সূর্য অস্তাচলের পথে। লোহিতসাগরের ওপর দিয়ে বইছে ঠান্ডা বাতাস। দিনের আলো নিভে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ঠান্ডার কামড়।

সূর্য ডুবলে ফের তৈরি হলাম সকলে। নাইট ডাইভিং। রাতের অন্ধকারে হবে সাগরের গভীরে

স্কুবা ডাইভিং। অতীব রোমাঞ্চকর। সূর্য ডুবে গেছে দিক্‌চক্রবালে। গোধূলির আলোছায়া। আকাশে রঙের খেলা। নেমে আসছে রাতের অন্ধকার। ডাইভিং-এর পোশাক পরে যন্ত্রপাতি সামলে ছোট ছোট দলে ঝাঁপ দিতে লাগলাম সাগরের জলে।

আমার সঙ্গে ডিয়েগো, পর্তুগিজ। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। দুজনে কাছাকাছি রইলাম। ডাইভিং-এর নিয়ম অনুযায়ী দুই বা তিনজনের ছোট ছোট দলে থাকতে হয়, প্রয়োজনে যাতে একজন আর একজনকে সাহায্য করতে পারে। কিছু পরেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চের আলোয় প্রবালপ্রাচীরের মধ্য দিয়ে ধীরগতিতে এগোচ্ছি। রহস্যময় সাগর-গহ্বর। অসাধারণ অনুভূতি। টর্চের আলো দেখে এগিয়ে আসছে মাছের পাল। আলোর বৃত্তের বাইরে অন্ধকার। বিপদের আশঙ্কা প্রতিক্ষণেই।

অভূতপূর্ব এই অনুভূতির আস্বাদন করছিলাম পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে। ষষ্ঠেন্দ্রিয় চূড়ান্ত সজাগ। ক্যামেরাবন্দি করছি অপূর্ব অভিজ্ঞতা। দ্রুত সঞ্চরমাণ জীবকে টর্চ বা ফ্ল্যাশের আলোর বৃত্তে ধরে রেখে ফটোগ্রাফি এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ। এই স্মৃতি অমূল্য। সারা জীবনের পাথেয়।

সাগরের গভীরে এক অন্যধরনের ধ্বনি। রাতের অন্ধকারে আরও প্রকট। পৃথিবীর নিজস্ব ধ্বনি, এক অনুরণন, যেন অবচেতন থেকে উঠে আসা অনাহত নাদ। অবচেতনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছি যেন। প্রবালপ্রাচীরের ওপর দিয়ে ভেসে যেখানে এসেছিলাম সেখানে হঠাৎ কয়েকশো মিটার গভীর গিরিখাত। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আরও অন্ধকার করাল গহ্বর। এখানে পৌঁছে ফিরে চলা।

জাহাজ থেকে একটা ওয়াটারপ্রুফ ডাইভিং টর্চ দড়িতে বেঁধে জলে ডুবিয়ে রাখা ছিল, অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্তি যাতে না হয়। কোরালের পাহাড়ের আড়ালে মাঝে-মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেও অনেকটা দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিল টর্চের আলো।

ঘণ্টাখানেক সাগরের গভীরে থেকে আমরা ফিরে চললাম জাহাজের দিকে, এক আশ্চর্য অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা সঙ্গে নিয়ে। নাইট ডাইভিং দিয়ে শেষ হল এবারের মতন আমার ডাইভিং অভিযান। জাহাজে ফিরে এসে পরিষ্কার জলে ডাইভিং স্যুট আর যন্ত্রপাতি ভালভাবে ধুয়ে মেলে দিলাম। সমুদ্রের লবণাক্ত জল যন্ত্রপাতির পক্ষে ক্ষয়কারক। আগামীকাল রাতে আমার ফেরার ফ্লাইট। ডাইভিং-এর নিয়ম অনুযায়ী ফ্লাইটের আগে চব্বিশ ঘণ্টা জলে নামতে নেই, নইলে শারীরবৃত্তীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে একে বলে ডিকম্প্রেশন সিকনেস। আগামীকাল সারাদিন জাহাজে থাকব। দলের বাকিরা ডাইভিং করবে কারণ ওদের ফেরার ফ্লাইট আরও দু-তিনদিন পর।

পরদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম। ক্রুজ জাহাজ এখন ফিরতি পথে। সিনাই উপদ্বীপের সমান্তরালে কয়েক মাইল দূর দিয়ে ঢেউ ভেঙে ফিরে চলেছে। জাহাজের ছাদে শীতের দুপুরের মিঠে রোদে সান বাথ। অফুরন্ত অবসর। বিকেলের দিকে শার্ম আল শেখ-এর মেরিনা অর্থাৎ বন্দরে থামল জাহাজ। জাহাজের ইজিপশিয়ান ক্রুদের বিদায় জানিয়ে নামলাম। অনেকটা হেঁটে মেরিনার বিশাল প্রবেশপথ। সেখানে অপেক্ষারত দুটি গাড়িতে ভাগাভাগি করে বসলাম। শার্ম আল শেখ শহরের ভেতর দিয়ে চললাম। একই গাড়িতে গ্রিস থেকে আসা দলটি। ওদেরকে হোটেলে নামিয়ে আমাকে পৌঁছে দিল এয়ারপোর্ট।

থিকথিকে ভিড়। গোটা ইউরোপ থেকে আগত ট্যুরিস্টদের ঢল। বিশাল লম্বা লাইনের শেষে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স এবং চিরুনি তল্লাশি সিকিউরিটি চেকের পর অবশেষে ফেরার বিমানে বসলাম। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা যাত্রা শেষে ব্রিস্টলে যখন নামলাম তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। ফিরে এলাম লোহিতসাগরের অসাধারণ স্মৃতি নিয়ে।